২০২০ মানবপাচার রিপোর্ট: বাংলাদেশ

বাংলাদেশঃ দ্বিতীয় স্তর

বাংলাদেশ সরকার মানবপাচার বন্ধের ন্যুনতম শর্ত পুরোপুরি পালন করেনি। তবে তা করার জন্য উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পূর্ববর্তী প্রতিবেদন সময়কালের তুলনায় সরকারের সামগ্রিক প্রচেষ্টা বর্ধমান রয়েছে বিধায় বাংলাদেশকে টিয়ার ২-তে বা দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অধিকসংখ্যক পাচারকারীকে বিচারের মুখোমুখি করা, পাচারের শিকার অধিকসংখ্যক ব্যাক্তিকে শনাক্তকরা, ২০০০ সালের ইউএন টিআইপি (UN TIP) প্রোটোকলে যোগ দেওয়া এবং প্রতিবেদনের সময়সীমার শেষের দিকে বাংলাদেশের পাচার বিরোধী আইন অনুসারে সাতটি পাচার বিরোধী ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়াও সরকার রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর প্রবেশের অনুমতি প্রদান অব্যাহত রেখেছে। তবে সরকার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ন্যূনতম মান অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো মানব পাচার সংক্রান্ত মামলাসমূহের তদন্তের পরিমাণ হ্রাস করেছে। পাচারসংক্রান্ত অপরাধে সরকারি লোকজনের যোগসাজশের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদনগুলোকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। এছাড়াও রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক শ্রম ও যৌনকাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পাচারের শত শত বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন থাকা সত্ত্বেও সেগুলো যাচাইয়ের জন্য তদন্ত শুরু করেনি। অনুমোদিত পতিতালয়গুলোসহ শিশু যৌন কর্মী পাচারের ব্যাপক প্রতিবেদন থাকা সত্ত্বেও সরকার পাচারের শিকার হওয়া শিশুদের শনাক্ত করতে বা প্রাপ্ত প্রতিবেদনগুলো অনুসন্ধানের চেষ্টা করেনি। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো জানায়, তারা প্রতিবেদন কালে সৌদি আরবে জোরপূর্বক শ্রমের শিকার হওয়া সম্ভাব্য এক হাজারেরও বেশি বাংলাদেশী ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছে। তা সত্ত্বেও সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষতিগ্রস্তদের সেবা দেওয়া বা জোরপূর্বক শ্রমের অভিযোগগুলো তদন্তের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা জানায়নি। তদুপরি, বিদেশে কর্ম লাভের ক্ষেত্রে নাগরিকদের ছাড়পত্র দেয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত সংস্থা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) নিয়োগ সংস্থাগুলোকে সুযোগ দিয়েছিল প্রাক-প্রস্থান প্রশিক্ষণ থেকে মানব পাচার সম্পর্কিত তথ্য বাদ দিতে। বিশেষত কীভাবে একজনের নিয়োগকর্তা বা নিয়োগ সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে হয় সে বিষয়ক তথ্য বাদ দিয়েছিল। বিএমইটি কিছু অভিবাসী শ্রমিককে কোন রকম প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই তাদের শোষণকারী নিয়োগ সংস্থাগুলোর সাথে শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে সালিশে বসতে বাধ্য করেছিল। সরকার অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে উচ্চ নিয়োগ ফি নিতে নিয়োগকর্তাদের অনুমতি প্রদান অব্যাহত রেখেছে। সেই সাথে সরকার অবৈধভাবে পরিচালিত দালাল সমস্যার সুরাহা নিয়মিতভাবে করেনি। ফলে শ্রমিকদের পাচারের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকতে হয়েছে। পাচারের শিকার হওয়া ভুক্তভোগীদের সেবা পাওয়ার সুযোগ অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে; সরকারি কর্মকর্তাগণ ধারাবাহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের শনাক্তকরণ পদ্ধতি কার্যকর করেনি বা চিহ্নিত ক্ষতিগ্রস্থদের সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করেনি; বিদেশি নাগরিক, যারা পাচারের শিকার ভুক্তভোগী, সুরক্ষামূলক পরিষেবাগুলো গ্রহণ করতে পারেননি; এবং পাচারের শিকার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন আশ্রয়ের ব্যবস্থা নেই।

অগ্রাধিকারমূলক সুপারিশঃ

মানবপাচারের সঙ্গে জড়িতদের বিচার ও দণ্ডিত করার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে হবে। বিশেষ করে শ্রমিক পাচারকারী ও জড়িত সরকারি কর্মকর্তাদের বিচার। একইসঙ্গে বিচারে যেন যথাযোগ্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

লাইসেন্সধারী জনশক্তি নিয়োগকারী সংস্থাগুলো শ্রমিকদের কাছ থেকে যে নিয়োগ ফি নেয় তা বন্ধ করার পদক্ষেপ নিন। এ ফি নিয়োগকারীর তরফ থেকে পরিশোধ করা নিশ্চিত করা হোক।

যেসব ঘটনায় ভুক্তভোগী ব্যক্তির অন্যত্র যাওয়ার বিষয় নেই সেগুলোসহ রোহিঙ্গাদের পাচারের বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগগুলোর ব্যাপারে তদন্ত এবং বিচারের উদ্যোগ বৃদ্ধি করুন।

ভুক্তভোগীদের সঠিকভাবে সহায়তা করার জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি করুন এবং তাদের এই সেবা দেওয়ার জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর (ওসওপি) চালু করুন।

মানবপাচারের ভুক্তভোগীদের সহায়তায় সেবা সুবিধা সম্প্রসারণ করুন। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, বিদেশি নাগরিক এবং দেশের বাইরে গিয়ে শোষিত ভুক্তভোগীগণ এই সেবার আওতায় থাকবে।

আদালতের আদেশ ছাড়াই বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে পাচারের ভুক্তভোগীদের পরিষেবা প্রদানের অনুমতি দিন।

সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র ছেড়ে যাওয়ার আগে পাচারের শিকার হওয়া প্রাপ্তবয়স্ক ভুক্তভোগীদের তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সম্মতি নেওয়ার বিষয়টি বন্ধ করুন।

ইন্টার-সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করুন এবং রোহিঙ্গাদের পাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে যাথাযথ ব্যবস্থা কার্যকর করুন।

পাচারের ভুক্তভোগী চিহ্নিত করতে এবং তাদের সংশ্লিষ্ট সেবাকেন্দ্রে পাঠাতে সহায়তার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, শ্রম পরিদর্শক ও অভিবাসন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আরও জোরদার করুন।
নিয়োগ এজেন্ট এবং দালালদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া পুরোপুরি বাস্তবায়ন করুন এবং সকল নিয়মকানুন মানা হচ্ছে কিনা তা নজরদারিতে রাখুন।
বিদেশে পাঠানোর আগে শ্রমিকদের যেসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তার মান বাড়ান। এসব প্রশিক্ষণে শ্রমিকের অধিকার, শ্রম আইন এবং বিচার ও সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করুন।

দেশের বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থায় রোহিঙ্গারা কীভাবে আইনি অভিযোগ জানাবেন তার সুস্পষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করুন। এসব পদ্ধতি সম্পর্কে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও রোহিঙ্গা শিবিরের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দিন।

পাচারবিরোধী তৎপরতায় সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য এনজিও ও সুশীল সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন। এর অংশ হিসেবে ভুক্তভোগীদের সেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে পাচারের

ভুক্তভোগীদের কাছে গিয়ে তাদের সহযোগিতা করার আরও বেশি সুযোগ দিন।

পাচারের শিকার ভুক্তভুগীদের জন্য সেবা বাড়ানো এবং অ্যান্টি-ট্র্যাফিকিং ট্রাইব্যুনাল পরিচালনা করাসহ ২০১৮-২০২০ এর জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করুন।

বিচার

সরকার পাচারকারীদের দোষী সাব্যস্তির হার বাড়িয়েছে, তবে পাচারের ঘটনার তদন্তের হার কমিয়েছে এবং যৌনকাজে ব্যবহারের জন্য অভ্যন্তরীণভাবে যেসব পাচার হয় বা পাচারের সঙ্গে সরকারি লোকজনের সম্পৃক্ততার বিষয়টি সমাধানে সরকার পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। উভয় সমস্যাই ব্যাপকভাবে রয়ে গেছে। ২০১২ সালের মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে (পিএসএইচটিএ) যৌন কাজের উদ্দেশ্যে পাচার ও শ্রমিক পাচারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে পাঁচ বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অন্যুন ৫০ হাজার টাকা জরিমানার সাজা রাখা হয়েছে। জোরপূর্বক শ্রমকে (শ্রম দাসত্ব) পৃথক আরেকটি অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে অবশ্য একটু কম শাস্তির কথা বলা আছে। এ অপরাধে পাঁচ বছর থেকে ১২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। এসব দণ্ড যথেষ্টই কঠোর। এর মধ্যে যৌন কাজে পাচারে যে শাস্তির কথা বলা আছে তা ধর্ষণের মতো অন্যান্য গুরুতর অপরাধের সাজার সঙ্গে তুলনীয়। সরকার পুলিশ একাডেমিতে পাচারবিরোধী একটি প্রশিক্ষণ মডিউলের মাধ্যমে পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিও দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে বিচার বিভাগীয়, অভিবাসন বিষয়ক এবং সীমান্ত বিষয়ক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করেছে। পুলিশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পিএসএইচটিএ আইন বাস্তবায়নের বিধিমালা সম্পর্কে কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কি না, সে বিষয়ে সরকার কিছু জানায়নি। সরকার ২০১৭ সালেই এটির প্রচার শুরু করেছিল।

সরকার পিএসএইচটিএ - এর অধীনে ৪০৩টি মামলার তদন্ত করেছে (এর মধ্যে ২৯টি তদন্ত বিগত বছরগুলো থেকে অব্যাহত), ৩১২ জন সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে (যৌন কাজের উদ্দেশ্যে পাচারের অভিযোগে ২৫৬ জন এবং জোরপূর্বক শ্রমের জন্য ৫৬ জন) মামলা করেছে এবং পাচার সম্পর্কিত নয়টি মামলায় ২৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। তবে, কমপক্ষে একটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল শিশু বিক্রির জন্য যা আন্তর্জাতিক আইনে মানব পাচার অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় না। এই হিসেবে পূর্ববর্তী প্রতিবেদনকালের তুলনায় তদন্তের সংখ্যা কমেছে, তবে দোষী সাব্যস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী প্রতিবেদন বছরে সরকার ৫৯২ টি মামলা তদন্ত করেছিল, অজানা সংখ্যক সন্দেহভাজনের বিচার করেছিল এবং পাঁচটি মামলায় আটজন পাচারকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। (প্রতিবেদন বছরে) বিচার বিভাগ ৩৯টি মামলা নিষ্পত্তি করে। বিচারকগণ ৩০টি মামলায় ৬৮ জন পাচারকারীকে খালাস দেয়, নয়টি মামলায় ২৫ জন পাচারকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং এদের মধ্যে ১৭ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিচার বিভাগ দোষী সাব্যস্ত অন্য আটজনের সাজার কথা জানায়নি। এ সাজা পূর্ববর্তী প্রতিবেদনকালের অনুরূপ যখন বিচার বিভাগ আটটি দোষী সাব্যস্তির মধ্যে সাতটিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেছিল। সরকার জানিয়েছে যে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪,৪০৭টি পাচারের মামলা তদন্ত বা বিচারাধীন রয়ে গেছে। পূর্ববর্তী প্রতিবেদন বছরে বেশিরভাগ ঘটনাই ছিল রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অভিবাসীদের পাচারের ((Smuggling) বিষয়। এগুলোর মধ্যে মানবপাচারের অপরাধ (Human trafficking) ছিল কিনা তা অস্পষ্ট। এ বছর গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে অভিবাসী চোরাচালানের সুস্পষ্ট উপাদান সংবলিত ঘটনায় পুলিশ পিএসএইচটিএ - এর অধীনে মামলা দায়ের করেছে যেগুলোতে শ্রম বা বাণিজ্যিকভাবে যৌন কাজে ব্যবহারের জন্য শোষণের কোন আলামত

ছিল না। সরকার স্বীকার করেছে যে, সমস্যাটা যত বড় সে তুলনায় পাচারের ঘটনার তদন্ত, বিচার ও সাজার পরিমাণ অপর্যাপ্তই রয়ে গেছে। পিএসএইচটিএ - এর অধীনে গ্রেপ্তার হওয়া সন্দেহভাজন পাচারকারীদের সাজা প্রাপ্তির হার ১.৭ শতাংশ।

অনেক কর্মকর্তা মানবপাচারের বিষয়টি বোঝেন না এবং সময় সময় তারা অভিবাসী পাচারের (migrant smuggling) সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলেন। পর্যবেক্ষকগণ প্রতিমাসে অনুমোদিত পতিতালয়গুলোতে শিশু যৌন কর্মী পাচারের একাধিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা সত্ত্বেও কিছু কর্মকর্তা দেশের অভ্যন্তরীণ পাচার, বিশেষত শিশুদের যৌন কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পাচারের অস্তিত্ব অস্বীকার করে চলেছেন। আইনী প্রক্রিয়া চলাকালীন পুলিশ এবং প্রসিকিউটরদের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব থাকে না। ফলে মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটে এবং প্রসিকিউশনের জন্য মামলাটি দুর্বল হয়ে পড়ে। বৈদেশিক ঘটনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি কর্মকর্তাগণ প্রায়শই প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করেন না এবং বিদেশি সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পর্যাপ্ত চুক্তি নেই। কিছু পর্যবেক্ষক উল্লেখ করেছেন যে পুলিশ পাচারের অভিযোগ পাওয়ার পর মামলাটির বিচারের জন্য অভিযোগপত্র দাখিল করতে আট বছর পর্যন্ত সময় নিতে পারে। প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল হওয়া থেকে মামলার রায় হওয়া পর্যন্ত পাচারের মামলাগুলোতে গড়ে ১১ বছর সময় ব্যয় হয়। বেসরকারি সংস্থাগুলো জানিয়েছে, এমন বিলম্বের ফলে পর্যাপ্ত তদন্ত হচ্ছে না ও বিচারে বিঘ্ন ঘটছে। বেশিরভাগ সন্দেহভাজন কারাগারের বাইরে অবস্থান করেন এবং ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্য না দেওয়ার জন্য ঘুষ দেয়ার বা হুমকি দেয়ার সুযোগ পান। সাত জন বিচারক নিয়োগসহ মানব পাচারের মামলার একচেটিয়া শুনানির জন্য সরকার পিএসএইচটিএ - তে নির্ধারিত সাতটি পাচার বিরোধী ট্রাইব্যুনাল গঠনের পদক্ষেপ নিয়েছে। মহিলা ও শিশু ট্রাইব্যুনালে মানব পাচারের মামলাগুলোর শুনানি চলতে থাকে। তবে এই মামলাগুলো পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত কর্মী এবং সম্পদ নেই। প্রসিকিউটরদেরও পাচার বিষয়ক মামলা পরিচালনায় দক্ষতার অভাব বিদ্যমান। পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, সরকার বিচারপূর্ব তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট সম্পদের যোগান দেয়নি। কিন্তু প্রস্তুতির অভাব থাকলেও কৌঁসুলিরা আইনের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী ১৮০ দিনের মধ্যে মামলা শেষ করে দেওয়ার চেষ্টায় থেকেছেন। ব্রুনেইতে সন্দেহভাজন বাংলাদেশি শ্রমিক পাচারকারীদের পাসপোর্ট প্রত্যাহার করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার জন্য বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে ব্রুনেইতে বাংলাদেশ হাই কমিশন সেদেশের সরকারের সাথে কাজ করেছে। সরকার নির্বাহী শাখার অধীনে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাম্যমাণ আদালতকে শ্রম আইন লঙ্ঘন, মানব পাচারের মামলা ও অভিবাসী চোরাচালানের মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য নিযুক্ত রেখেছে। পারে। ভ্রাম্যমান আদালত সর্বোচ্চ তিন বছরের সাজা দিতে পারেন যা মানবপাচার সংক্রান্ত পিএসএইচটিএ আইনের ন্যুনতম সাজার মেয়াদ পাঁচ বছরের চেয়ে কম। একটি এনজিও বলেছে, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও গ্রামবাসীর সমন্বয়ে গড়া পাঁচ সদস্যের কয়েকটি গ্রাম আদালত কিছু পাচারের ঘটনার বিচার করেছেন। তবে এ আদালত শুধু অর্থদণ্ড করতে পেরেছেন । এনজিওটি এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ভুক্তভোগীরা এসব আদালতের তরফ থেকে হুমকি, প্রতারণা ও দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকতে পারেন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জোরপূর্বক শ্রম ও যৌন কাজে ব্যবহারের জন্য শত শত রোহিঙ্গা পাচার হচ্ছেন এমন প্রতিবেদন অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা রোহিঙ্গা সম্পর্কিত যে ঘটনাগুলো জানিয়েছে সেগুলো শুধু তাদের নৌকায় চলাচল (বাংলাদেশ থেকে বিদেশ গমন) সংক্রান্ত —যেগুলো পাচারের উপাদান ছাড়াই অভিবাসী পাচার হিসেবে গণ্য হতে পারে। সরকার আশ্রয় শিবিরের ভেতরে অভিযোগ উত্থাপনের জন্য কোনো সুস্পষ্ট আইনি ব্যবস্থা রাখেনি। আর এর ফলে পাচারের শিকার রোহিঙ্গারা যেমন সুবিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি দুর্বৃত্তরা রেহাই পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। পুলিশ ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো অপরাধের শিকার রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য বেশ কিছু আশ্রয় শিবিরে একাধিক 'হেল্প ডেস্ক'

চালু রেখেছে। তবে পুলিশসহ নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের প্রতি আস্থার অভাবের ফলে পাচারসহ বিভিন্ন অপরাধের শিকার অনেক মানুষ সহায়তার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারস্থ হতে বিরত থেকেছে। বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের দায়ের করা পাচার সংক্রান্ত কোনো মামলা হাইকোর্ট গ্রহণ করেননি। যদিও আইনত বাংলাদেশের আদালতে রোহিঙ্গারা পাচার সংক্রান্ত মামলা করতে পারে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অভিযোগ, বাংলাদেশের কিছু কর্মকর্তা রোহিঙ্গা নারী ও শিশু পাচারে সহায়তা করেছে। এর মধ্যে আছে ঘুষের বিনিময়ে পাচারকারীদের আশ্রয়শিবিরগুলোতে ঢুকতে দেওয়া।

মানবপাচারে ও পাচার-সম্পর্কিত দুর্নীতিতে সরকারি লোকের জড়িত থাকা এবং সেই সঙ্গে অপরাধীদের নিষ্কৃতি পেয়ে যাওয়া এখনো বড় ধরনের উদ্বেগের বিষয় যা প্রতিবেদন বছরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বাধা দিয়েছে। সরকার এ জাতীয় দাবি স্বীকার করা বা তদন্ত করতে অনাগ্রহী ছিল। নিবন্ধিত পতিতালয়গুলোতে কর্মীদের বয়স অন্তত ১৮ বছর কিনা তা যাচাই করতে কাগজপত্র দেখা অথবা ১০ বছর বা এমন কম বয়সী কর্মীদের ভুয়া নথিপত্র যাচাইয়ে পুলিশের নিয়জিত থাকার কথা। কিন্তু কিছু পুলিশ প্রায়শই ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে এ জাতীয় অপব্যবহার উপেক্ষা করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। কিছু লেবার অ্যাটাশে, স্থানীয় রাজনীতিবিদ, বিচারক এবং পুলিশ সদস্য ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের কাছে মামলা পরিচালনার জন্য ঘুষ চান। পর্যবেক্ষকদের অভিযোগ, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের কিছু কিছু কর্মকর্তা মানবপাচারে সহায়তা করেন। আর গ্রামাঞ্চলের কিছু পাচারকারীর রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে, যে কারণে তারা অপরাধ করেও পার পেয়ে যায়। এনজিওগুলোর বক্তব্য, পুলিশের কাছে পাচারের বিষয়ে অভিযোগ করা থেকে ভুক্তভোগীদের বিরত রাখতে কিছু স্থানীয় রাজনীতিবিদ তাদেরকে পাচারকারীদের সহযোগীদের কাছ থেকে অর্থ নিতে নানাভাবে রাজি করিয়েছেন। অন্যান্য কিছু পর্যবেক্ষক অভিযোগ করেছেন, কোনো কোনো পুলিশ কর্মকর্তা অপরাধীদের আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে সহায়তা করতে ধীরগতিতে বা ত্রুটিপূর্ণভাবে তদন্তকাজ চালিয়েছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে যেখানে পুলিশ সদস্য আছে সেখানেও এমন ঘটনা রয়েছে। আগের প্রতিবেদন সময়কালে ১২ বছর বয়সী দুই জন মেয়েকে জোরপূর্বক মাদক পাচার ও বাণিজ্যিক যৌনকর্মে নিযুক্ত করার অভিযোগে এক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তারের খবর জানায় পুলিশ। পরবর্তীতে সরকার মামলাটিকে অস্বীকার করে।

সংসদ সদস্যসহ বেশ কিছু সরকারি কর্মকর্তা বিদেশি কর্মসংস্থান সংস্থারগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন। তাই উদ্বেগ রয়েছে যে এই কর্মকর্তাগণ যখন অবমাননাকর নিয়োগ সংস্থাগুলোর বিচার ও অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা বাড়ানোর মত অভিবাসী বান্ধব অনুশীলনগুলোর অনুমোদনের ব্যাপারে কাজ করবেন তখন স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলোর মাধ্যমে জানা যায় যে একজন বাংলাদেশি সংসদ সদস্য ২০ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি কর্মীকে বিদেশে কাজের ভিসায় নেয়ার জন্য কুয়েতের কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান করেন। কিন্তু শ্রমিকদের তাদের চুক্তির বাইরে ভিন্ন চাকরি এবং কম বেতন দেয়া হত এবং সংসদ সদস্য প্রায়শই শ্রমিকদের মজুরির পরিমাণ কমিয়ে দিতেন বা আদৌ কোন মজুরি দিতেন না। গণমাধ্যম জানায় যে ২০১৫-২০১৮ সাল পর্যন্ত মালয়েশিয়ার কর্মসংস্থান সংস্থাগুলো ও ১০টি বাংলাদেশি নিয়োগ সংস্থা বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উভয় দেশের কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের ঘুষ দেয়। একচেটিয়া ব্যাবসা প্রতিষ্ঠার ফলে কর্মীদের জন্য নির্ধারিত নিয়োগ ফি ৩৭,০০০ টাকা (৪৪০ ডলার) থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০,০০০ টাকা (৪,৭১০ ডলার) - যা সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ ফি সীমার চেয়ে বেশি — এতে করে অভিবাসী শ্রমিকদের ঋণজনিত দায়ের ফাঁদে পড়ার ঝুঁকিও বাড়ে। বাংলাদেশের উচ্চ আদালত দুবার সতর্কতা জারির পরে সরকারি তদন্তের একটি প্রতিবেদন ২০১৯ সালের নভেম্বরে জমা দেয় যেটি শুনানির অপেক্ষায় ছিল। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে এক

কেন্দ্রীয় আদালত শ্রম আইন লংঘনের অভিযোগে বাংলাদেশি কনস্যুলার অফিসের এক সাবেক কর্মকর্তা ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে আর্থিক সাজার রায় দেন। আদালত ওই দম্পতিকে বাংলাদেশি এক ব্যক্তিকে নয় লাখ ২০ হাজার ডলার দেওয়ার নির্দেশ দেন। বাংলাদেশি নাগরিকটি ওই দম্পতির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাফিকিং ভিকটিমস প্রটেকশন অ্যাক্ট (টিভিপিএ) ছাড়াও অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে দেওয়ানি মামলা করেছিলেন। ওই কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে এসেছেন এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে রাষ্ট্রদূত হিসেবে বহাল ছিলেন। একটি আপিলের ফলশ্রুতিতে ২০১৮ সালের মে মাসে প্রায় ৮৫০,০০০ ডলার জরিমানার একটি সংশোধিত রায় হয়। ২০১৯ সালের মে মাসে উভয়পক্ষ একটি নিষ্পত্তিতে পৌঁছায় এবং ২০১৯ সালের জুনে স্বেচ্ছায় মামলাটি খারিজ করা হয়। এই বন্দোবস্তের আগে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট কর্তৃক প্রতিশোধমূলক আচরণের অভিযোগ করেন বাদী। কনস্যুলেট কর্মকর্তাটির জবাবদিহির জন্য সরকার প্রতিবেদন সময়কালে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানায়নি।

সুরক্ষা

পাচারের শিকার ভুক্তভোগীদের শনাক্তকরণের হার পরিমিত আকারে বাড়িয়েছে সরকার। কিন্তু দেশের বাইরে চিহ্নিত বাংলাদেশি ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা দিতে অত্যন্ত অপর্যাপ্ত সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। সরকার ৫৮৫ জন সম্ভাব্য ভুক্তভোগীকে শনাক্ত করে যা আগের প্রতিবেদন সময়কালে চিহ্নিত ৪১৯ জন থেকে বেশি। তবে এ সংখ্যা ২০১৭ সালে শনাক্তকৃত ৭৭০ জন ভুক্তভোগীর সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। পাচারকারীরা বাধ্যতামূলক শ্রমে নিযুক্ত বেশিরভাগ ভুক্তভোগীকে শোষণ করে। সংগঠনগুলো অন্ততপক্ষে অতিরিক্ত ১,৪৫৬ জন পাচারের ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করে এবং তাদের সহায়তা দেয়। এর মধ্যে ডিসেম্বর ২০১৮-২০১৯ সালে চিহ্নিত ৫৪৩ জন রোহিঙ্গা অন্তর্ভুক্ত। পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সরকারের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাচারের ভুক্তভোগীদের শনাক্তকরণে নিজস্ব এসওপি (SOPs) ছিল। তবে সরকারি কর্মকর্তাগণ এই এসওপিগুলো কতটা ব্যাপকভাবে প্রচার বা ব্যবহার করেছেন সে ব্যাপারে সরকার তেমন কিছু জানায়নি। কিছু পুলিশ কর্মকর্তা স্বীকৃত যৌনপল্লীতে অভিযানের সময় পাচারের শিকার ভুক্তভোগী শনাক্ত করতে একটি চেকলিস্ট ব্যবহার করেন। তবে সরকার চেকলিস্টটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ বা প্রচারের ব্যবস্থা করেনি। আর এর ব্যবহারও নিয়মিত ছিল না।

সরকারের কাছে ভুক্তভোগীর জন্য সেবার কোনো প্রমিত মানদণ্ড অথবা গৃহীত নীতি নেই, যদিও এটি করার জন্য আদালতের একটি নির্দেশ বজায় ছিল। কিছু সরকারি কর্মকর্তা সেবার জন্য সুপারিশের ক্ষেত্রে একটি এনজিওর ব্যবহৃত লিখিত নির্দেশিকা অনুসরণ করেন। কর্তৃপক্ষ পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠাতে পারে। সরকার ৭৪ জন ভুক্তভোগীকে সরকারি বা এনজিও পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠায় এবং অন্যান্য সেবার জন্য ৮৪ জনকে বেসরকারী সংস্থার কাছে পাঠায়, যা আগের প্রতিবেদন সময়কালে রেফার করা প্রায় ২৫ জন ভুক্তভোগীর চেয়ে বেশি। বেসরকারী সংস্থাগুলো পাচারের ভুক্তভোগীদের অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান করেছে। পাচারের শিকার ব্যক্তিদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো সেবা সরকার প্রদান করেনি । তবে বাংলাদেশ পুলিশ পাচারসহ বিভিন্ন সহিসংতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা করেছে। দেশের আট বিভাগেই এ ধরনের কেন্দ্র আছে। এ কেন্দ্রগুলো স্বল্পমেয়াদী আশ্রয়, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। বিদেশি একটি সরকারের আংশিক সহযোগিতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পাচারের শিকারসহ সহিংসতার শিকার নারী ও শিশু ভুক্তভোগীদের জন্য কিছু দীর্ঘমেয়াদী আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করে যেগুলো একইরকম সেবা প্রদান করতে পারত। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর জন্য অবশ্য (কোন ভুক্তভোগীকে আশ্রয় দিতে) আদালতের আদেশের প্রয়োজন হয় এবং তাঁরা পরিবারের সদস্যের সম্মতি ছাড়া (আশ্রয়কেন্দ্র) ত্যাগ করতে পারেন না। সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিতদের অধিকতর

পুনর্বাসন সেবা প্রদানের জন্য যোগাযোগ করতে হলে এনজিও ও অন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে আদালতের অনুমতি নিতে হয়। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নানা রকম অপব্যবহারের শিকার হতে হয় বলে কিছু ভুক্তভোগী অভিযোগ করেন। কিছু আশ্রিত ভুক্তভোগী যারা পরিবারের সম্মতি আনতে পারেননি কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ১০ বছর পর্যন্তও আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে বাধ্য করেছে। কিছু ভুক্তভোগী এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে "কারাগার" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রতিবেদন সময়কালে পুলিশ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আশ্রয়কেন্দ্রগুলো কতজন পাচারের ভুক্তভোগীকে সহায়তা দিয়েছে তা সরকার জানায়নি। সরকারি হাসপাতালগুলোতেও ওয়ান-স্টপ সেন্টার রয়েছে যেগুলো অপরাধের শিকার নারী ভুক্তভোগীদের সহায়তা দিতে সক্ষম। যদিও কর্মকর্তারা এই কেন্দ্রগুলোতে নারীদের পাঠিয়েছেন কিনা এবং পাঠিয়ে থাকলে কীভাবে পাঠিয়েছেন অস্পষ্ট রয়ে গেছে। সরকার সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের পাচারের শিকার হিসেবে গণ্য করে না। সরকারি বা বেসরকারি কোন আশ্রয়কেন্দ্রেইপুরুষ ভুক্তভোগীদের থাকার ব্যবস্থা নেই, যদিও বেশিরভাগ এনজিও ক্ষতিগ্রস্থ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের আশ্রয়প্রদান ছাড়া অন্যান্য সেবা প্রদান করতে পেরেছে।

পাচারের শিকার বিদেশিদের জন্য সরকারি সেবা পাওয়ার কোনো সুযোগ বাংলাদেশ সরকার দেয়নি। কিছু এনজিও পাচারের শিকার বিদেশিদের কিছু সহায়তা দিয়েছে। এনজিওগুলো পাচারের শিকার রোহিঙ্গাদের দু'তিনদিনের জন্য সেফ হোমে রাখার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। কিন্তু এরপরই তাদের রিফিউজি শিবিরে ফেরত পাঠাতে হয়। সেখানে এসব মানুষ পাচারের ঝুঁকির মধ্যে রয়ে যায়। সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মানবাধিকার বা মানবিক সহায়তা নিয়ে কাজ করে এমন কিছু এনজিও'র বিদেশি তহবিলের অনুমোদন স্থগিত রেখেছে যার ফলে পাচারের ভুক্তভোগীসহ ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানে বিরুপ প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। মানবপাচার রোধ সংক্রান্ত পিএসএইচটিএ আইন অনুযায়ী পাচারের শিকার ব্যক্তি বিচার চলাকালীন পুলিশি নিরাপত্তা ও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেয়ার সুযোগসহ সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রাখেন। কিছু ভুক্তভোগী তাদের পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলার তদন্ত ও বিচারে অংশ নিলেও সরকার ও এনজিওগুলো উল্লেখ করেছে যে আইনের এই ধারার অপর্যাপ্ত বাস্তবায়নের ফলে পাচারের শিকার বেশিরভাগ মানুষ তাদের পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলায় অংশ গ্রহণ করেননি। পাচারকারীদের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তা করতে পিএসএইচটিএ একটি সহায়তা তহবিল গঠন বাধ্যতামূলক করার পরেও সরকার তা করেনি। পাচারের শিকার সকল ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ চেয়ে দেওয়ানি মামলা দায়ের করতে পারেন। গ্রেপ্তারের পূর্বে সরকার ব্যক্তিদের মধ্যে পাচারের ব্যাপারে তথ্য যাচাই করে বলে জানা গেছে। যৌনকর্মীর পেশায় থাকা নারীসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাচারের শিকার ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অভিন্ন এসওপি মেনে চলেনি। এ কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যৌনকাজের উদ্দেশ্যে পাচার হওয়া নারীদের এমন কোনো বেআইনি কাজ করার জন্য সাজা দিয়ে থাকতে পারে যা করতে পাচারকারীরা তাদের বাধ্য করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন যৌনপল্লীতে অভিযান চালিয়ে বিদেশি যৌনকর্মীদের ভিসার শর্ত না মানার কারণ দেখিয়ে গ্রেপ্তার করে। তবে তারা এর পেছনে পাচারকারীচক্রের সম্ভাব্য সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি খুঁজে দেখার চেষ্টা করে না। এনজিওগুলো বলেছে, বিভিন্ন সরকারি কর্তৃপক্ষ পাসপোর্ট না থাকার জন্য সমুদ্র ও স্থল পথে পাচারের শিকার ব্যক্তিদের পাচারের ব্যাপারে তথ্য যাচাই না করেই আটক ও জরিমানা করে থাকতে পারে এবং কিছু ভুক্তভোগীকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে থাকতে পারে। যেসব দেশে ফেরত পাঠালে দুঃখকষ্ট বা বিপদে পড়ার আশঙ্কা আছে পাচারের শিকার বিদেশিদের এমন দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার কোনো আইনি বিকল্প সরকারের হাতে ছিল না।

বিদেশে যৌন ও শ্রম পাচারের পাচারের শিকার বাংলাদেশিদের জন্য সরকারি সহায়তার প্রচেষ্টা ছিল ন্যূনতম পর্যায়ে। প্রক্রিয়াটি সহজতর করার উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ভারত সরকার পাচারের শিকার এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ এবং প্রত্যাবাসন সম্পর্কিত ২০১৫- এর সমঝোতা

স্মারক (MOU) সংশোধন করে চলেছে। দেশগুলোর সরকারের সহায়তায় ও এনজিও অর্থায়নে ভারত থেকে অতিরিক্ত ১০০ পাচারকৃত ব্যক্তিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। তবে দীর্ঘ ও জটিল অনুমোদন প্রক্রিয়ার ফলে কিছু বাংলাদেশি ভুক্তভোগীকে ছয় বছর অবধি ভারতীয় আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করতে হয়। অভিবাসী শ্রমিকদের সহায়তার জন্য বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাস ও কনস্যুলেটে ২৯টি শ্রম অফিস রয়েছে। এই অফিসগুলো প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন। অন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো জানিয়েছে এই শ্রম বিষয়ক দপ্তরগুলোতে কর্মী এবং সংস্থনের সংকট রয়েছে। বিশেষ করে উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে যেখানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী শ্রমিক রয়েছে সেখানেও এই সংকট রয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় চাকরিদাতাদের নির্যাতন থেকে পালানো নারী শ্রমিকদের জন্য, যারা পাচারের শিকার হয়েছিলেন বলে ধারনা করা হয়, বিদেশে চারটি আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করে। কিন্তু এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো কতজন ভুক্তভোগীকে সহায়তা দিয়েছে তা জানায়নি। যদিও সরকার পাচারের শিকার কিছু ব্যক্তির দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য অর্থায়ন করতে পেরেছিল, তবে প্রায়শই এক্ষেত্রে এত দীর্ঘ সময় লেগে যায় যে ক্ষতিগ্রস্থরা নিজেরাই অর্থায়ন করে এবং অতিরিক্ত ঋণের বোঝা বহণ করতে বাধ্য হয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিমানবন্দরে একটি ডেস্ক খোলে যা বিদেশ ফেরত পাচারের শিকারসহ নারী কর্মীদের ৫০০০ টাকা (৫৯ ডলার) পর্যন্ত সরবরাহ করে এবং তাদের জন্য লভ্য বেসরকারী সংস্থার সেবা সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে।

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে সৌদি আরব থেকে ১,২৫০ জন নারী অভিবাসী কর্মী বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন বলে জানায় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এর মধ্যে অনেকেই শ্রমিক পাচারের লক্ষণের কথা জানিয়েছেন। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাসগুলো কোন ব্যক্তিকে শ্রমিক পাচারের শিকার হিসেবে চিহ্নিত করেনি। তবে কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো প্রত্যাবাসনের পর কাউকে কাউকে পাচারের শিকার হিসাবে চিহ্নিত করে, যেমনটি প্রতিফলিত হয় শনাক্তকৃত মোট ভুক্তভোগীদের ক্ষেত্রে। এছাড়াও সংস্থাটি ২০১৯ সালে সৌদি আরব থেকে ১২৯ মৃত বাংলাদেশি গৃহকর্মীকে দেশে ফিরিয়ে আনে। এই নারী গৃহকর্মীদের বেশিরভাগই চাকরিতে মারা যায় বলে কথিত এবং ২৪ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। শারীরিক ও যৌন নির্যাতন, চুক্তি বদল, চলাচলে নিষেধাজ্ঞা এবং মজুরি পরিশোধ না করাসহ অসংখ্য পাচারের সূচকের ঘটনার অভিযোগে প্রতিবেদন সময়কালে সৌদি আরব থেকে প্রায় ২,৪০০ বাংলাদেশি গৃহকর্মী দেশে প্রত্যাবর্তন করে বলে নিশ্চিত করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। কিন্তু সরকার সর্বমোট কেবল ১২১ জন বাংলাদেশি নাগরিককে দেশে প্রত্যাবর্তনে সহায়তা করে। প্রতিবেদনের সময়কালে অন্যান্য দেশ থেকে আরও কমপক্ষে ৪২৫ জন বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিক পাচারের উল্লেখযোগ্য সূচক নিয়ে দেশে ফেরেন। সরকার মাঝেমধ্যে শ্রমিক পাচার সহ শ্রম শোষণের ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের তাদের নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা চালানোর জন্য বিদেশে দূতাবাসগুলোতে রাখে। অনেক ভুক্তভোগী বাড়ি ফিরে যাওয়ার ফলে মামলাগুলো আর চালাতে পারেনি। সরকার শ্রমিকদের গন্তব্য দেশগুলোতে কোন প্রকার পাচারের মামলা করেনি। কিছু কর্মকর্তা শ্রমিক পাচারের ভুক্তভোগীদের দোষারোপ করেন এবং তারা "অপ্রস্তুত ছিলেন" বলে দাবী করেন। সরকার প্রত্যাবাসনের পরে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তার জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলোর উপর নির্ভরশীল ছিল। যেসব অভিবাসী শ্রমিক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কাজ পায় তারা জোরপূর্বক শ্রমসহ শ্রম ও নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মের ক্ষেত্রে একটি সালিশী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পেতে মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করতে পারে। তবে পাচার-সম্পর্কিত দুর্নীতির ফলে এ প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্থ হয় এবং এ প্রক্রিয়ায় প্রায়শই ন্যূনতম ক্ষতিপূরণ মেলে। অন্ততপক্ষে একটি এনজিও জানিয়েছে সালিশের আয়োজক বিএমইটি অভিবাসী শ্রমিকদের সঙ্গ দিতে এনজিও'র আইনজীবীদের বাধা দিয়েছে। ফলে তাদেরকে শক্তিশালী নিয়োগ সংস্থা এবং বিএমইটি উভয়ের বিরুদ্ধে একাকী লড়তে হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জানায় যে ২০১৯ সালে ২১৪ জন নিয়োগ দালালের

বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে। যার ফলে নিয়োগ দালালরা ৩৫২ জন অভিবাসী শ্রমিককে প্রায় ৩৪.৪ মিলিয়ন টাকা (৪০৪,৭১০ ডলার) ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। । ২০১৮ সালে মোট ৬৬০টি মামলার নিষ্পত্তির ফলস্বরূপ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২৫.৭ মিলিয়ন টাকা (৩০২,৩৫০ মার্কিন ডলার) প্রদান করা। তবে এর মধ্যে জোরপূর্বক শ্রমের কোনো অভিযোগ ছিল কিনা মন্ত্রণালয় তা জানায়নি। যেহেতু সরকার বিদেশে অভিবাসী শ্রমিকদের শোষণের অভিযোগ তদন্তের উদ্যোগ নেয়নি এবং দেওয়ানি প্রতিকারগুলো অপ্রতুল রয়ে গেছে সেহেতু নাগরিক সংগঠনগুলো পাচারে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের কিছু আর্থিক প্রতিকার প্রাপ্তিতে সহায়তা করার জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

প্রতিরোধ

সরকার পাচার প্রতিরোধে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ২০১৮-২০২২ সময়কালের জন্য পাচারবিরোধী জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজও সরকার অব্যাহত রেখেছে। সরকার সুশীল সমাজের সাথে সহযোগিতার মাত্রা বাড়ালেও বৃহত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যসহ এই পরিকল্পনার একটি বড় অংশ বাস্তবায়ন ও অর্থ জোগাড়ের জন্য সরকার এদের উপরেই নির্ভর করে। স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় দ্বিমাসিক পাচার বিরোধী আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির নেতৃত্ব প্রদান অব্যাহত রেখেছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন যে মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা দুর্বল এবং তাঁরা পিএসএইচটিএ-এর আলোকে পাচার বিরোধী প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করার জন্য একটি স্থায়ী জাতীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। বিগত বছরগুলোর সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর পাচার বিরোধী আইন প্রয়োগের তথ্য বা মানব পাচার সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন সর্বসাধারনের জন্য আর প্রকাশ করে না। ২০১৯ এর সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ ২০০০ সালের জাতিসঙ্ঘের টিআইপি প্রোটোকলকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী আইন (ওইএমএ) অনুযায়ী নিয়োগের নামে প্রতারণা এবং বৈধ ফি'র অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া ফৌজদারি অপরাধ। তবে এই বিধান থাকা সত্ত্বেও খোদ সরকার অনুমোদিত ফি ৮৫,০০০ থেকে ২৬২,০০০ টাকা (১,০১০- ৩,১২০ ডলার)। এ অঙ্ক এত বেশি যে তা অনেক অভিবাসনপ্রত্যাশী শ্রমিককে ঋণগ্রস্ত করা এবং ঋণের ভিত্তিতে জবরদস্তির মাধ্যমে পাচারের ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। একটি গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে যে ২০১৮ সালে সৌদি আরব ভ্রমণকারী বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদেরকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার জন্য সরকারের নির্ধারিত নিয়োগমূল্যের থেকে গড়ে ৪৫০ শতাংশের বেশি প্রদান করতে হয়েছিলো। গবেষণা অনুযায়ী, সৌদি আরবের জন্য সরকারের নির্ধারিত শ্রমিক নিয়োগ ফি একজন বাংলাদেশি শ্রমিকের সাড়ে পাঁচ মাসের বেতনের সমতুল্য এবং বাস্তবে কর্মীদের দুই বছরের বেশি বেতনের সমপরিমাণ ফি প্রদান করতে হয়েছিল। প্রতিবেদনের সময়কালে সৌদি আরবে বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াতে সেদেশের সরকারের সাথে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আলোচনা শুরু করে। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা) ১,১৮৬ লাইসেন্সধারী জনশক্তি রপ্তানিকারকের কার্যক্রম দেখাশোনা করে। এর নজরদারি টাস্ক ফোর্স অসাধু নিয়োগকারী, ট্রাভেল এজেন্সি ও সাব-এজেন্টদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছে। সাব-এজেন্ট হচ্ছে গ্রাম এলাকায় কাজ করা অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত এজেন্ট যারা সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর সঙ্গে বৈধ নিয়োগকারীদের যোগাযোগ করিয়ে দেয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় চাকরির চুক্তি ও নিয়োগ বিধিমালা লঙ্ঘনসহ নানা আইন অমান্য করার দায়ে ১৬২ টি রিক্রুটিং এজেন্সির কার্যক্রম স্থগিত করেছে। কর্তৃপক্ষ কিছু নিয়োগকারী দালালকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে পাঠায় যারা ২০১৩ সালের ওইএমএ -এর আওতায় অবৈধভাবে অভিবাসী শ্রমিকদের বিদেশে পাঠানো, নিয়োগের জন্য

বেআইনী চার্জ নেওয়া এবং প্রতারণামূলক নিয়োগসহ শ্রমিক পাচার-সম্পর্কিত অন্যান্য অপরাধের জন্য ২৮ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত জরিমানা বা কারাদণ্ড নির্ধারণ করে। তবে এ ধরণের অপরাধ রোধে জরিমানা যথেষ্ট নয়। ২০১৮ সালে ভ্রাম্যমাণ আদালত ১১ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে, যদিও সেবছর ও প্রতিবেদন বছরে কতগুলো ক্ষেত্রে পাচারের বিষয়টি রয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে জালিয়াতির মাধ্যমে প্রবাসী শ্রমিকদের শোষণের জন্য নিয়োগ প্রদান বা নিয়োগের জন্য অবৈধভাবে ফি নিয়েছে এমন ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রন করার মতো একটি আইনী কাঠামোর অভাবের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার সকল রিক্রুটমেন্ট এজেন্টের নিয়োগের পূর্বে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়েরকাছ থেকে অনুমতি চেয়ে আবেদন করার নির্দেশ দেয়া শুরু করে। বিদ্যমান বা নতুন এজেন্টরা আইন মেনে চলছে কিনা তা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কীভাবে নজরদারি করবে সেটি স্পষ্ট নয়। বায়রা স্বীকার করেছে, অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের নিয়োগের আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগেই বৈধ নিয়োগকারীদের দেওয়া ফি'র বাইরে প্রায়শই অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে থাকেন। *দালালরা* অনেক সময় জাল ভিসা ও অন্যান্য দলিলপত্র সরবরাহ করে অভিবাসী কর্মীদের সরাসরি বিদেশে কথিত চাকরির ব্যবস্থা করে। অনেক সময় তারা অভিবাসন প্রক্রিয়া এবং গন্তব্য দেশের চাকরি সম্পর্কে ভ্রান্ত তথ্য দিয়ে থাকে। পর্যবেক্ষকগণ বলেছেন, অনেক সময় অভিবাসী কর্মীর আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতেই তার চাকরির বিষয়টি স্থির হয়, দক্ষতা বা সক্ষমতার ভিত্তিতে নয়। তারা আরও বলেন, অভিবাসনপ্রত্যাশী কর্মীরা অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশে যেতে সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ ফির পাঁচগুণ পর্যন্ত দিয়েছে। সরকার কয়েকটি দ্বিপক্ষীয় শ্রম চুক্তি অনুসরণ করা অব্যাহত রাখে। অংশত এর লক্ষ্য ছিল বিদেশে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সুরক্ষা দেওয়া, যদিও সরকার যে এমওইউ সমূহ কার্যকর করেছে তার কোনও প্রমাণ নেই। সরকার বিদেশ যাওয়ার আগে কর্মীদের প্রশিক্ষণের শর্ত বহাল রেখেছে। কিছু অভিবাসী কর্মীর জন্য এ প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিল নিরাপদ অভিবাসন ও পাচারবিরোধী বিষয়। এর অন্যতম দিক হচ্ছে নারী গৃহকর্মীদের জন্য বিদেশ যাত্রার আগে ৩০ দিনের এক প্রশিক্ষণ কোর্স। সরকার অসংখ্য জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয় এবং টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের (টিটিসি) মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক তথ্য দেয়। তবে কতজন অভিবাসী এই সেবাগুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং বিদেশ ভ্রমণের আগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন তা স্পষ্ট নয়। বিদেশগামী কর্মীদের প্রস্তুত করার ও প্রশংসাপত্র দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থা বিএমইটি কিছু রিক্রুটিং এজেন্সিকে "রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়" এমন বিষয়ের উপর ব্রিফিং নিষিদ্ধ করার অনুমতি দেয়।

শ্রম পরিদর্শকগণ কর্মস্থলে নজরদারি ও জোরপূর্বক শ্রম ও শিশুশ্রমের অভিযোগ তদন্তের জন্য পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে দায়বদ্ধ ছিলেন। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর হিসাব অনুযায়ী শিশুশ্রমের ৯৩ শতাংশই (বাধ্যতামূলক শিশুশ্রমসহ) অনানুষ্ঠানিক খাতে ঘটলেও শ্রম পরিদর্শকরা ওই খাতে পরিদর্শন চালাননি। বাধ্যতামূলক শ্রম ও শিশুশ্রমসহ শ্রম লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো পরিদর্শনের জন্য কর্মীর সংখ্যা ও সংস্থানের পরিমাণ অত্যন্ত অপর্যাপ্ত ছিল। পরিদর্শকগণ আগে থেকে জানিয়ে পরিদর্শনে যেতেন যা নিয়োগকর্তাদের শিশুশ্রমসহ অন্যান্যা শোষণমূলক কর্মকান্ডকে আড়াল করার সময় দেয়। পরিদর্শকরা সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রমের জন্য নিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে ৪২টি মামলা করেছিলেন। কিন্তু এই মামলাগুলো তদন্তের জন্য পুলিশের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে কোন রিপোর্ট তাঁরা করেননি। সরকার সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে এবং স্থানীয় পাচার বিরোধী কমিটিগুলোর সহায়তায় জাতীয়ভাবে সচেতনতামূলক প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়া অব্যাহত রেখেছে। অনেক সময় তা করা হয় এনজিওগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে।সরকার জনসাধারণ যাতে করে অপরাধের তথ্য জানাতে পারেন সেজন্য বেশ কয়েকটি হেল্পলাইন খোলা

রেখেছে। প্রতিবেদন সময়কালে হেল্পলাইনগুলোতে আসা কল থেকে ২৭টি ক্ষেত্রে পুলিশ পাচারের শিকার ভুক্তভোগীদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে।

সরকার শরণার্থীদের সহায়তা দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিওগুলোকে অনুমতি প্রদান অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২০ সালের জানুয়ারিতে শরণার্থী শিবিরে অবস্থানরত ১১-১৩ বছর বয়সী কিছু রোহিঙ্গাকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দানের লক্ষ্যে বার্মিজ জাতীয় পাঠ্যক্রম চালু করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার পাইলট প্রোগ্রামকে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে সরকার রোহিঙ্গাদেরকে আনুষ্ঠানিক স্কুল ব্যবস্থায় প্রবেশ, বৈধভাবে কাজ করা, স্বাধীন চলাচল ইত্যাদির ওপর নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রেখেছে। । এছাড়াও, (কক্সবাজারের) চারটি পৌরসভায় বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা উভয়ের ক্ষেত্রেই জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম স্থগিত রেখেছে। এসবের কারণে তাদের জন্য পাচারের শিকার হওয়ার ঝুঁকি বেড়েছে। সরকার সেনাদের শান্তিরক্ষী হিসেবে বিদেশে মোতায়েনের আগে পাচারবিরোধী প্রশিক্ষণ দিয়েছে। কূটনৈতিক কর্মকর্তাদেরও পাচারবিরোধী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।২০১৭ সালে হাইতিতে শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগে একজন প্রত্যাবাসিত শান্তিরক্ষীর বিরূদ্ধে সরকার তদন্ত শুরু করে। পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের সময়কালে জাতিসংঘ এ বিষয়টি প্রমাণ করেছিল। সরকার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যৌন কার্যক্রম কমাতে প্রচেষ্টা চালায়নি। শিশু যৌন পর্যটনের চাহিদা হ্রাসেও কোন উদ্যোগ নেয়নি।

পাচারের চিত্র

পাচারকারীরা বাংলাদেশের ভেতরে যেমন স্থানীয় ও বিদেশি ভুক্তভোগীদের শোষণ করে, তেমনি বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশীদের শোষণ করে, এমন চিত্র গত পাঁচবছরের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। বাংলাদেশি পুরুষ,নারী এবং শিশু যারা সেচ্ছায় মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় অভিবাসিত হয়, বিশেষ করে ব্রুনেই, মালয়েশিয়া ও মালদ্বীপ ইত্যাদি দেশে কাজের জন্য যায়, তারা পাচারকারীদের দ্বারা জোরপূর্বক শ্রমে শোষিত হয়। বাংলাদেশি শ্রমিক যারা দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করে তারাও পাচারকারীদের জোরপূর্বক শ্রমের দ্বারা শোষিত হয়। অনেক বাংলাদেশি প্রতিবছর কাজের জন্য অবৈধ পথে অভিবাসি হন; তারা পাচারকারীদের নজরে পড়েন। দেশত্যাগের আগে অনেক অভিবাসনপ্রত্যাশী চাকরির মোটা ফি পরিশোধের জন্য ঋণ করতে বাধ্য হন। বায়রার রিক্রুটিং এজেন্টরা বৈধভাবে এবং লাইসেন্সবিহীন সাব এজেন্টরা অবৈধভাবে ওই ফি ধার্য করে। এ বিষয়টি অভিবাসী কর্মীদের ঋণের ফাঁদে পড়ে জোরপূর্বক শ্রমে বাধ্য হওয়ার ঝুঁকিতে ফেলে। কিছু রিক্রুটিং এজেন্সি, এজেন্ট ও নিয়োগকারীও চুক্তি বদলসহ চাকরি নিয়ে বিভিন্ন প্রতারণা করে। এ প্রতারণার মধ্যে রয়েছে নারী ও শিশুদের কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদেশে পৌঁছানোর পর যৌন কাজে ব্যবহার করা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কর্তৃপক্ষ ভানুয়াতুর নির্মাণ প্রকল্পে শতাধিক বাংলাদেশি পুরুষ শনাক্ত করেছে যারা জোরপূর্বক শ্রমের শিকার এবং কর্তৃপক্ষ প্রায় ৩০ হাজারেও অধিক ব্রুনেই অভিবাসী বাংলাদেশির কাছ থেকে বেতনের অর্থ না পাওয়াসহ চুক্তি পরিবর্তনের অভিযোগ পায়। মালদ্বীপে কর্মরত ২৩৪,০০০ বাংলাদেশি কর্মীর মধ্যে ৬৯,০০০-এর অধিক অবৈধ এবং কিছু শ্রমিক জানিয়েছেন তাঁদের পাসপোর্ট আটকে রাখা হয়েছে,কম পারিশ্রমিক পেয়েছেন বা মজুরি পাননি ও নিয়োগ নিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন। সৌদি আরবে পাচারকারীরা হাজার হাজার বাংলাদেশি নারী গৃহকর্মীর মধ্যে একটি বড় সংখ্যককে শ্রম পাচারের মাধ্যমে শোষণ করে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন সৌদি আরবে থেকে সম্প্রতি প্রতি মাসে প্রায় ২০০ গৃহকর্মী জোরপূর্বক শ্রমের সূচক নিয়ে বাংলাদেশে ফেরত আসেন।

বাংলাদেশি নারী ও বালিকাদের দেশের বাইরে ভারত, পাকিস্তান ও উপসাগরীয় দেশগুলোতে যৌন পাচারের মাধ্যমে পাচারকারীরা শোষণ করে। বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে লেবানন অথবা জর্ডানে গৃহকর্মীর কাজ করতে যাওয়া কিছু নারীকে পাচারকারীরা সিরিয়ায় জোরপূর্বক শ্রম

ও যৌন কাজের জন্য বিক্রি করে দিয়েছে। কিছু চাইনিজ পাচারকারী বাংলাদেশি নারীদের, বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীদের বিবাহের মাধ্যমে যৌন কাজে ব্যবহার করার জন্য পাচার করে এবং গৃহস্থালি কর্মকান্ডে শ্রম দিতে বাধ্য করে। পাচারকারীদের কেউ কেউ জাল কাগজপত্র তৈরি করে শিশুদের ১৮ বছরের বেশি বয়সী দেখিয়ে বিদেশে পাঠায়। সৌদি আরব, কুয়েতসহ উপসাগরীয় দেশসমূহ থেকে প্রতিবেদন সময়কালে শত শত অবৈধ বাংলাদেশি কর্মীকে বহিস্কার করেছে। এদের মধ্যে কিছু কর্মীকে তাদের নিয়োগকর্তারা জোরপূর্বক শ্রমে বাধ্য করে এবং তাদের কাগজপত্র ইচ্ছাকৃতভাবে তামাদি হয়ে যেতে দিয়েছিলেন।

পাচারকারীরা বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক ও শিশুদের বৈধ ও অবৈধ পতিতালয়সহ বিভিন্ন ব্যক্তিমালিকানাধীন হোটেলগুলোতে পাচার করা অব্যাহত রেখেছে। পাচারকারীরা কাজ দেওয়ার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে গরিব নারী ও শিশুদের যৌনকাজের জন্য পাচার করে এবং নারী ও ছোট মেয়েদের যাদের কারও কারও বয়স মাত্র ১০ বছরের মত কাজ দেওয়ার শর্ত হিসেবে ধরা মাত্রাতিরিক্ত ঋণ শোধ করার জন্য কাজ করতে বাধ্য করে। যৌনকাজের উদ্দেশ্যে শিশু পাচার এখনো ব্যাপক। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন তাঁরা অনুমান করেন যে প্রায় ২০,০০০ শিশু বাংলাদেশের পতিতালয়গুলোতে বেড়ে উঠছে ও বাণিজ্যিক যৌন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেক নারী ও মেয়ে জানান যে তাঁরা ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সে অবমাননাকর বাল্যবিবাহ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে তাঁরা পাচারকারীদের খপ্পরে পড়েন এবং তারা পরবর্তীতে তাঁদের পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়। অন্যান্য নারীরা জানান যে তাঁরা পতিতালয়ে বেড়ে উঠেছেন কারণ তাঁদের মায়েরা বাণিজ্যিক যৌন কর্মে জড়িত এবং পতিতালয়ের মালিকরা তাদের শিশু থাকা অবস্থায় বাণিজ্যিক যৌনকর্মে নিযুক্ত করে। কিছু নিবন্ধিত পতিতালয়ের মালিকরা বাচ্চাদের স্টেরয়েড নিতে বাধ্য করে যাতে তাদের বয়স্ক দেখায়। পতিতালয়গুলোতে কর্মীদের বয়স অন্তত ১৮ বছর কিনা তা যাচাই করতে কাগজপত্র দেখা অথবা ১০ বছর বা এমন বয়সী কর্মীদের জন্য ভুয়া নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য পুলিশের নিয়জিত থাকার কথা। কিন্তু কিছু পুলিশ প্রায়শই ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে অনুমোদিত পতিতালয়গুলোতে এ জাতীয় অপব্যবহার উপেক্ষা করে। কিছু পাচারকারী তাদের শিকারদের মাদকাসক্ত হতে বাধ্য করে এবং বাধ্যতামূলক যৌনকাজ ও বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হতে তাদের মাদকাসক্তিকে ব্যবহার করে। পাচারকারীরা খাদ্য, আশ্রয়, সুরক্ষা ও অর্থের বিনিময়ে রাস্তার শিশুদের যৌন কাজে ব্যবহার করে।

শ্রমিকদের কাজে বাধ্য করার জন্য পাচারকারীরা প্রায়শই ঋণ-ভিত্তিক জবরদস্তি করে। পাচারকারীরা কাজ দেওয়ার শর্ত হিসেবে ধরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থকে কর্মীর নেওয়া ঋণ হিসেবে ধরে। ওই কথিত ঋণের ভিত্তিতে তাদের শোষণমূলক শ্রমে বাধ্য করা হয়। পাচারকারীরা চিংড়ী ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম ও গার্মেন্টস কারখানা, ইটভাটা, শুকনো মাছ উৎপাদন এবং জাহাজভাঙ্গা শিল্পে শ্রম দিতে প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের বাধ্য করে। পাচারকারীরা ১৪ বছরেরও কম বয়সী শিশুদের চলাচল সীমাবদ্ধ করে ও নির্যাতনের মাধ্যমে গৃহস্থলী কর্মে বাধ্য করে। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার ২০১৮ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বাংলাদেশে গৃহস্থলী কর্মে ৪ লক্ষাধিক শিশু নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশি শিশুরা ট্যানারিগুলিতে জোরপূর্বক শ্রমের ঝুঁকিতে থাকে। পাচারকারীরা অনেক সময় পথশিশুদের অপরাধ বা ভিক্ষা করতে বাধ্য করে। ভিক্ষুকচক্রের নেতারা অনেক সময় উপার্জন বাড়ানোর জন্য শিশুদের শারীরিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। বিশেষত সীমান্তবর্তী এলাকায় পাচারকারীরা শিশুদের মাদক, বিশেষত ইয়াবা উৎপাদন ও পরিবহন করতে বাধ্য করে। পাচারকারীরা বাংলাদেশি পরিবার ও ভারতীয় অভিবাসী শ্রমিকদের ইটের ভাটা, চিংড়ি চাষ এবং চা এস্টেটগুলোতে জোরপূর্বক কাজ করাতেঋণ নিতে বাধ্য করে। কিছুসংখ্যক ভাটা মালিক বাধা শ্রমে আটকে পড়া নারীদেরকে তাদের পরিবারের কথিত ঋণ শোধের নামে যৌনকর্মে বাধ্য করে। বিভিন্ন এনজিওর অভিযোগ, কিছু কর্মকর্তা মানব পাচারকারীদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ক্রসিং ও নৌঘাটগুলোতে তৎপরতা চালানোর সুযোগ

দেন। উত্তর কোরিয়ার সরকার সেদেশের নাগরিকদের বাংলাদেশে কাজ করার জন্য বাধ্য করে থাকতে পারে।

বার্মিজ সীমান্তের নিকটবর্তী কক্সবাজারের বিভিন্ন শরণার্থী শিবির ও স্থানীয় এলাকা এবং দেশের অন্যান্য কিছু স্থান মিলিয়ে বাংলাদেশে দশলাখের বেশি অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা বাস করছে। এদের মধ্যে লাখ সাতেক এসেছে ২০১৭ সালের আগস্টের পর। পাচারকারীরা শরণার্থী শিবিরগুলোর পুরুষ, নারী ও শিশুকে যৌনকাজ ও শ্রম দুই উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে পাচারের জন্য শোষণ করে। পাচারকারীরা রোহিঙ্গা মেয়েদের বাংলাদেশের ভেতরেই চট্টগ্রাম ও ঢাকায় এবং সীমান্তের বাইরে ভারত, মালয়েশিয়া ও নেপালে যৌন কাজের জন্য নিয়ে যায়। সেটা কখনও কখনও চাকরি বা বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ব্যবহার করে হয়ে থাকে। কিছুসংখ্যক পাচারকারী এসব মেয়েকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে 'বেচাকেনা' করে। স্থানীয় কিছু অপরাধী চক্র রোহিঙ্গা নারীদের রাতে শিবির থেকে নিয়ে যৌন ব্যবসায় কাজে লাগায় এবং দিনের বেলা শিবিরে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর অভিযোগ, কিছু বাংলাদেশি কর্মকর্তা রোহিঙ্গাদের পাচারে সহায়তা করে। তাদের সহায়তার মধ্যে রয়েছে ঘুষের বিনিময়ে পাচারকারীদের শিবিরে ঢুকতে দেওয়া। বাংলাদেশে দোকানকর্মী, জেলে, রিকশাঅলা ও গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করার জন্য অনেক রোহিঙ্গা ছেলেমেয়েকে শিবির থেকে নিয়োগ করা হয় এবং কাজ করতে বাধ্য করা হয়। বাংলাদেশি কিছুসংখ্যক জেলে রোহিঙ্গা পুরুষদের ঋণের জালে আটকে ফেলে। রোহিঙ্গারা ওই বাংলাদেশি জেলেদের জমিতে আশ্রয়ঘর তুললে তাদেরকে শোষণমূলক শ্রমে বাধ্য করতে ঋণের ফাঁদে ফেলা হয়। কয়েক দশক আগে বার্মা থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা কিছু রোহিঙ্গা বাংলাদেশি জেলেদের কাছে কয়েক দশক ধরে ঋণ-ভিত্তিক বাধ্যতামূলক শ্রমের ফাঁদে আটকা পড়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে কিছুসংখ্যক পাচারকারী রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি অভিবাসীদের নৌকায় করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঠিয়েছে। এদের মধ্যে যারা মুক্তিপণ দিতে পারেনি পাচারকারীরা তাদের জোরপূর্বক শ্রম দেওয়ার জন্য বিক্রি করে দিয়েছে। একাধিক এনজিও ও মানবিক সহায়তা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন, বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীন অবস্থা এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ বা বৈধভাবে কাজ করতে না পারা তাদের পাচার হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর অভিযোগ, কিছু বাংলাদেশি কর্মকর্তা রোহিঙ্গাদের পাচারে সহায়তা করে। তাদের সহায়তার মধ্যে রয়েছে ঘুষের বিনিময়ে পাচারকারীদের শিবিরে ঢুকতে দেওয়া। কিছু বিদেশি নাগরিক শিশু যৌন পর্যটনের চাহিদা তৈরি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে কক্সবাজারের কাছে কমবয়সী রোহিঙ্গা মেয়েদের শোষিত হওয়ার ঘটনা।